# দুর্নীতি কি সত্যি কোনো ইস্যু ছিল?

যত দিন যাচ্ছে, অনেক বিষয় ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কার্যত বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও এর রাজনীতি-অর্থনীতি ধ্বংস করার সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের অংশ হিসেবেই যে এক-এগারো পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাতে এখন আর কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তাদের জীবনমানে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। বিশ্বের একক পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় দোসররা ইসলাম ও মুসলমানবিরোধী যে অভিযানের সূত্রপাত করেছে ইরাক ও আফগানিস্তানে, বাংলাদেশকেও তারা সে বলয়ের ভেতরে স্থাপন করে সাধারণ মানুষের সেই অভাবনীয় সাফল্যের ধারা দেখে। বন্যাপীড়িত হতদরিদ্র দেশ হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিতি লাভ করেছিল বাংলাদেশ এরশাদের স্বৈরাচারী শাসনামলে। কিন্তু মাত্র ১০ বছরেই বাংলাদেশ দ্রুত সে অপবাদ ঘুচিয়ে দেয়ার পথে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে চিন্তিত করে তোলে সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসরদের। দেশে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতায় ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামি শক্তির বিপুল বিজয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা বাংলাদেশবিরোধী তাদের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলে।

পৃথিবীর কোনো দেশেই বোধকরি হাড্ডি ছুড়লে কুত্তার অভাব হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের এত বড় ধ্বংসযজ্ঞ আর হত্যালীলা সত্ত্বেও ইরাক ও আফগানিস্তানে পাওয়া গেছে নূরী আল-মালিকি ও হামিদ কারজাইয়ের মতো লোকদের। বাংলাদেশেও সে রকম লোকের অভাব ঘটেনি। ২০০১ সালের আগে থেকেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র শুরু করে তার অংশ হিসেবেই বিদেশী অর্থে গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধরনের তথাকথিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। তার একটি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা টিআইবি। অপরটি সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ বা সিপিডি।

টিআইবি ২০০০ ও ২০০১ সালে শেখ হাসিনার শাসনকালে বাংলাদেশকে পৃথিবীর সেরা দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে ঘোষণা করে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। সে সময় আওয়ামী রাজনীতির বিরোধীরা খুব খুশি হয়েছিলেন। কারণ তাতে

শেখ হাসিনার সরকারকে সেরা দুর্নীতিবাজ বলা সহজ হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশকে সেরা দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যে গবেষণা চালানো হয়েছিল, সে অর্থের জোগান দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস এক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সরকার তাদের এ টাকার হিসাব চায়নি। শেখ হাসিনা সরকার যদি তখন টিআইবি'র অর্থের উৎস সন্ধান করত, তাহলে বিষয়টি তখনই স্পষ্ট হতে পারত। লক্ষ করলে দেখা যাবে, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতি নিয়ে এই গরু খোঁজা কেবল তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলোতেই সীমাবদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র-ব্রিটেনে প্রতি বছর কী মাত্রায় দুর্নীতি হয়, তা দেখার দায় টিআইবি'র নেই। অথচ ওই সব দেশের একটি কেসের দুর্নীতি বাংলাদেশের ১০ বছরের দুর্নীতিকেও ছাড়িয়ে যাবে। ধনী দেশগুলোর তাহলে কী প্রয়োজন পড়ল যে, এরা গাঁটের অর্থ খরচ করে পোষ্যদের দিয়ে গরিব দেশে দুর্নীতির গরু খোঁজা শুরু করল?

কারণ একটাই। যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে দেশটিকে দুর্নীতিবাজ আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়। সে ব্যবস্থা কী? প্রয়োজনে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক-এডিবি টাকা দেবে না; এসব দেশের পণ্য কিনবে না ধনী দেশগুলো। তখন বাধ্য হয় এরা যেভাবে বলে সেভাবেই কাজ করতে। অর্থাৎ তাদের স্বার্থের অনুকূলে থাকতে।

বাংলাদেশের জন্য আরো বিপদ হলো, বাংলাদেশ মুসলমান অধ্যুষিত দেশ। যুক্তরাষ্ট্রে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসররা মুসলমান অধ্যুষিত দেশগুলোকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে ক্রুসেডে নেমেছে। এরা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী বলতে কেবলই মুসলিম দেশগুলোকে চিহ্নিত করছে। আর সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের জন্য সেসব দেশে অভিযান চালানোকে এরা অধিকার বিবেচনা করছে। বাংলাদেশকে চাপে রাখার আর একটি কৌশল এটাই। তাই যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসররা বাংলাদেশে প্রায়ই ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের অস্তিত্ব খুঁজে বের করছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই ইসলামি সন্ত্রাসবাদী খোঁজার অভিযানের পথ আওয়ামী লীগ আগেই প্রশস্ত করে রেখেছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফরের সময় বিএনপি'র মুখে চুনকালি মাখার উদ্দেশ্যে এবং যুক্তরাষ্ট্র যাতে কখনো বিএনপিকে ভালো চোখে না দেখে সে জন্য সরকারি খরচে বিভিন্ন প্রচার-পুস্তিকা বের করেছিল। তাতে বলা হয়েছিল, বিএনপি'র সাথে ইসলামি জঙ্গিরা আছে ও বিএনপি তাদের মদদ জোগাচ্ছে। যদিও বিএনপি জোটের শাসনকালে এরা এই অপবাদ অনেক কমিয়ে এনেছিল। কিন্তু তখনো আওয়ামী লীগের এই রাষ্ট্রঘাতী প্রচারণা অব্যাহত ছিল, এখনো আছে।

বাংলাদেশের আর একটি বিপদ তার জ্বালানিসম্পদ। বাংলাদেশে আছে উন্নতমানের কয়লা ও গ্যাস। এ ছাড়া ধারণা করা হচ্ছে, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার মধ্যে আছে বিপুল পরিমাণ তেল ও গ্যাস। পৃথিবীর জ্বালানি সঙ্কট প্রকট হচ্ছে। সে কারণে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর দরকার জ্বালানি তেল, গ্যাস ও কয়লা। বাংলাদেশের জ্বালানিসম্পদ দখলে নেয়াও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বাংলাদেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ। সে জন্যই এরা প্রায়ই অভিযোগ করে থাকে, বাংলাদেশে

আছে হুজি বা হরকাতুল জেহাদ, আছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীরা। ফলে বাংলাদেশে যখন-তখন হামলা করতে বাধা নেই।

প্রাথমিকভাবে রাজনীতিকরা লাগামহীন তথ্য-প্রমাণহীনভাবে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধেই ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করেছে। জোট সরকারের আমলে একবার অঙ্ক কষে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, জোট সরকারের মন্ত্রী-এমপি-নেতা-কর্মীরা তাদের পাঁচ বছরের শাসনকালে ১ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে। কোথায় পেলেন এমন আজগুবি তথ্য? সে কথা কেউ জিজ্ঞেস করেনি। শেখ হাসিনা এ কথা বলার পর শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে সহস্র মুখে আওয়ামী নেতা-কর্মীরা একই কথা প্রচার করেছে। রিকশাওয়ালা, কুলি-মজুর, হকাররাও সে কথা প্রচার করেছে। কিন্তু কেউ ভেবে দেখেনি, জোট সরকারের পাঁচ বছরের শাসনকালের যে পাঁচটি বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছিল, ওই অর্থ ছিল তার প্রায় আড়াই বছরের বাজেটের সমান। কিন্তু এরা কেউ কোনো দিন সমাজে অন্য কেউ দুর্নীতি করেছে এমন কথা বলেননি। দুর্নীতি সমাজের সব পেশার মানুষের মধ্যেই আছে। দুর্নীতি আছে আমলাতন্ত্রে, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, শিক্ষক, ডাক্তার, সাংবাদিক সব পেশার মানুষের মধ্যেই। কিন্তু রাজনীতিবিদরা কেবল তাদের নিজেদের দুর্নীতির কথাই প্রচার করেছেন। আর রাজনীতিকরা তথ্য-প্রমাণ ছাড়া যেকোনো কথা বলুক, মিডিয়া তা হুবহু প্রচার করেছে। তারাও কখনো প্রশ্ন করেনি। এই যে অভিযোগ এর ভিত্তি কী? মিডিয়া যদি দায়িত্বশীল হতো, তাহলে তারা প্রশ্ন করত। কেউ কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করলেই তা সত্য হয় না। মিডিয়া অসত্য প্রচারের বাহন নয়। তা ছাড়া মিডিয়ারও কোনো জবাবদিহিতা নেই। এমন ধরনের আইনও নেই। যে আইন আছে তার প্রয়োগ নেই। এভাবেই আকাশে-বাতাসে প্রচারিত হয়েছে রাজনীতিকরা বড় চোর। সমাজের আর সবাই সাধু।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কিন্তু তাদের কাজ করেই যাচ্ছিল। প্রতি বছরই তথাকথিত গবেষণা প্রকাশ করে যাচ্ছে। তাতে প্রতি বছরই বাংলাদেশকে সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে চিত্রিত করার প্রয়াস পায় টিআইবি।

আওয়ামী লীগ ও তার দোসরদের অদূরদর্শী রাজনীতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দেশকে এক ভয়াবহ অরাজক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়। ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির নির্বাচনের জন্য তারা ৩০০ আসনে মনোনয়নপত্রও দাখিল করে। আওয়ামী লীগ যদি ওই নির্বাচনে অংশ নিত, তাহলে তাদের দুর্গতি যেমন এতটা হতো না, তেমনি দেশের ভাগ্যেও নেমে আসত না এমন বিপর্যয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিলে বাংলাদেশবিরোধী দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য যে হাসিল হয় না। তারা আরো তৎপর হয়ে উঠতে থাকল এবং শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রকারীদের ফাঁদে পা দিলো আওয়ামী লীগ। কোনো ঘটনা-দুর্ঘটনা ছাড়াই নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াল আওয়ামী লীগ। জাতিসঙ্ঘ থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের সব তল্পিবাহক প্রতিষ্ঠান বলল, ২২ জানুয়ারির একতরফা নির্বাচন হলে এই সরকারকে কোনোরূপ সহযোগিতা

করবে না তারা। মেনে নেবে না তারা। ফলে কবর হয়ে গেল সাংবিধানিক সরকারের। সেনাবাহিনীর সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় বসে গেলেন ড. ফখরুদ্দীনের সরকার। তারাও বলতে চাইলেন, তারা এসেছেন সাংবিধানিক পন্থায়ই। প্রতিবাদ করল না কেউ। কিন্তু বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরও সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করার কথা ছিল। এরা নির্বাচনের দিকে যতটা না মনোযোগী ছিলেন, তার চেয়েও বেশি মনোযোগী ছিলেন দুর্নীতি দমনের নামে রাজনীতিকদের আটক করার ব্যাপারে। একেবারে ঢালাওভাবে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট যাকে পাওয়া গেল, গ্রেফতার করা হলো তাকেই। প্রথম প্রথম বিএনপি'র ওপর ক্র্যাকডাউন হলেও কিছু দিনের মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা শুরু হলো আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদেরও। আওয়ামী লীগ কেন? আওয়ামী লীগ তো এই সরকারকে সমর্থন জানাল, ভবিষ্যতে সরকারের সব কাজের বৈধতা দেবে বলে অঙ্গীকার করল, তাহলে আওয়ামী লীগারদের কেন গ্রেফতার শুরু করল সরকার। সম্ভবত দেখাতে চাইল, কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না তারা। দুর্নীতিবাজের রেহাই নেই।

না, সেটা তো মূল উদ্দেশ্য ছিল না। তাহলে শুধু রাজনীতিবিদরা কেন? কেন নয় আমলারা, কেন নয় অন্য কেউ? কারণ, এ সরকার এসেছে দেশের রাজনীতিবিদদের হেয় করতে। দেশকে রাজনীতিশূন্য করে দিতে। এ এক বিশাল ষড়যন্ত্রের অংশ। গত দেড় বছরে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের সে পরিকল্পনায় বহুলাংশে সফল হয়েছে। কিন্তু সচল আছে টিআইবি। রাজনীতিকদের তো ঘায়েল করা গেছে। তাদের কপালে তো দুর্নীতির সিল মেরে দেয়া গেছে। বলা হচ্ছে, রাজনীতিকদের দিয়ে দেশ শাসন করা হবে না। কারণ, তারা দুর্নীতিবাজ। তাহলে দেশ শাসন করবে কে? সেনাবাহিনী। হয়তো সরাসরি নিজেরা। কিংবা তাদের সমর্থক কোনো গোষ্ঠী। না, তাহলেও তো সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সফল হয় না। সেনাবাহিনীও তো একটা বড় শক্তি। তাদের অস্তিত্বও নিরঙ্কুশ করে না চক্রান্তকারীদের অভিপ্রায়।

এবারো টিআইবি তার তথাকথিত গবেষণার ফল প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, ২০০৬ সালের জুলাই-ডিসেম্বরের তুলনায় ২০০৭ সালের জানুয়ারি-জুন সময়ে দুর্নীতি তো কমেইনি বরং আরো ২ শতাংশ বেড়েছে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সরকারের আমলের চেয়ে সেনাবাহিনী সরকারের আমলে ঘুষ-দুর্নীতি আরো বেড়েছে। এই ঘুষ লেনদেনের ক্ষেত্রে আছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, যৌথ বাহিনী অর্থাৎ টিআইবি বলতে চাইছে, ঘুষের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীও পিছিয়ে নেই। যৌথ বাহিনীতেই ঘুষ বেশি।

মতলবটা কী তাহলে? দেশকে রাজনীতিশূন্য করার প্রাথমিক পদক্ষেপ সফল করা গেছে। সে কাজে সেনাবাহিনীকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে ইতোমধ্যেই জনগণের সাথে সেনাবাহিনীর একটা দূরত্ব সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। দেশকে রাজনীতিশূন্য করার প্রক্রিয়ায় রাজনীতির কিছু টোকাইকে সামনে আনা হয়েছে। যারা রাজনীতিক নন,

আধিপত্যবাদী শক্তির বশংবদ। এবার বর্তমান সরকারের চালিকাশক্তি সেনাবাহিনীর ওপর আঘাত হানতে হবে। রাজনীতির সাথে যাতে সেনাবাহিনীকেও ধ্বংস করে দেয়া যায়।

তাহলে ভবিষ্যতে এ দেশ শাসন করবে কে? সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সেসব কারজাই বা নূরীকে মদদ দেবে তারা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যেহেতু দুর্নীতিগ্রস্ত, তাহলে তারা বাদ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নেবে কে? সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেরাই।

এ রকম এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের জালে আটকে যাচ্ছি আমরা। এখান থেকে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থেই আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। অস্তিত্বের স্বার্থেই বের হয়ে আসতে হবে। আর বের হয়ে আসার সে পথ নির্বাচন। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও সব দলের অংশগ্রহণে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনীতিকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া। সেভাবেই আমরা এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি। এর জন্য চাই সব মহলের শুভবুদ্ধি।
লেখক ঃ কলামিস্ট

প্রবাসী
ডটকম
আমরা আপনার কথা বলি
www.probasi.com